সাহারা মরুভূমির বিভীষিকা

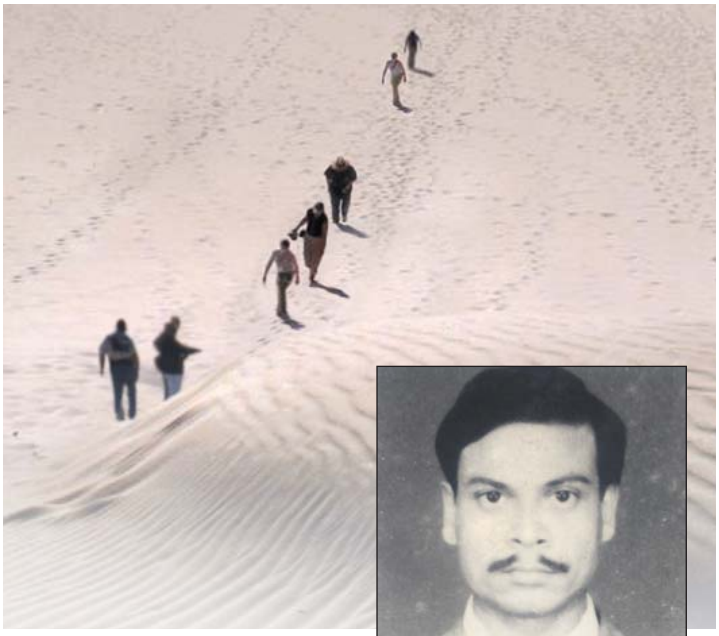

fga¨mvM‡ii R‡j, gi“fwgi ajvq
nvwi‡q hvIqv ¯c... Abvnvi,
Aavnv‡i gi“fwg‡Z KvUv‡bv w`b-ivZ-gvm... wbt¯ n‡q wd‡i
Avmv GK ¯cPvixi eYbv

মোঃ হানিফ মিয়া

খোন্দকার তাজউদ্দিন

জিঞ্জিরা বাসস্ট্যান্ড থেকে টেম্পো (হুড খোলা) করে তারানগর ইউনিয়নের আর্টি বড় ভাওয়াল গ্রামের মোঃ জহুরুল ইসলামের বাড়ি যখন পৌঁছাই, দুপুর ঠিক ১২টা। দোচালা টিনের ঘর এলোমেলো বিছানা। ঘরে আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। বৃদ্ধ মা বেগম অসহায়ের মতো এসে দাঁড়ালেন। আমার পোলার জন্য আড়াই লাখ টাকা দিলাম, ২ বিঘা ধানি জমি রেজিস্ট্রি করে দিলাম, তবু মনির হোসেন আমার পোলারে ইটালি পৌঁছে দিল না। পোলা আমার না খাইয়া জেলের ঘানি টানছে; মরুভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল এখন টাকা ফেরত দিলে বেঁচে যাই।

এই গ্রামের সচ্ছল কৃষকের মেয়ে মেরী। তাকে বিয়ে করে সুখের নীড় রচনা করেছিল কামরাঙ্গীচরের আবু হানিফ। নিজের শ্যালক ইটালি থেকে অনেক টাকা পাঠায়। স্ত্রীর পরামর্শে জিঞ্জিরায় ছোটখাটো ব্যবসা গুটিয়ে ইটালি যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। টানাটানির সংসারে সুখের ভিত রচনা করবেন। বৌয়ের গহনা ডিপিএস থেকে ঋণ, ব্যক্তিগত ধার-দেনা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা জমা দেন দালাল মনিরের করছে। না, আশা পূরণ হয় না, সাহারা মরুভূমির মিথ্যা মরীচিকার পেছনে দৌড়ে দীর্ঘ ৮ মাস কারাগারে কাটিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে একসময় ফিরে আসেন রিক্ত হস্তে। পিছে রচনা করে দীর্ঘ হয়রানির এক নির্মম ইতিহাস।

সাভার থানা ভাকুর্তা ইউনিয়নের ছলমাসি গ্রামের মোঃ দেলোয়ার হোসেন বেকারত্বের অভিশাপ ঘোচাতে পিতার পেনশনের টাকা, ব্যবসার সমস্ত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন ইটালি যাবার পথে। ৪ লাখ টাকা মনির হোসেনকে দিয়ে আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যে জীবন-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে মালি, গ্যাবন, মরক্কো, মৌরি তানিয়া, আলজেরিয়ায় জেলের ঘানি টেনে প্রায় মৃত অবস্থায় সর্বস্ব খুইয়ে ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে। তাদের সবাই সাহারা ট্র্যাজেডির নির্মম সাক্ষী।

গত ২৫ মার্চ দুপুর সাড়ে ১২টায় মোঃ হানিফ মিয়ার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখি, উঠানে খুঁটি ধরে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছেন হানিফ মিয়ার স্ত্রী মেরী বেগম। বড় ধরনের ঝড় বয়ে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে- দেখলেই বোঝা যায়। হানিফ মিয়া আছে কি না জিজ্ঞাসা করতেই বলে উঠলেন, আপনারা লেখালেখি করলে মনির টাকা দিব না। বিদেশে পাঠাব না। সব ধরনের আশ্বাস দেয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মোঃ হানিফ মিয়া এবং সাভারের ছলমাসি গ্রামের দেলোয়ার হোসেন।

হৃদয়বিদারক বর্ণনা আর আহাজারিত চারদিকের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। সহায়-সম্বল হারানো লোকগুলো প্রশ্ন করে তাদের কষ্টের কথা মনে করিয়ে দিতে বেশ খারাপ লাগছিল।

কামরাঙ্গীরচরের সাধারণ ব্যবসায়ী মোঃ হানিফের পড়ালেখা তেমন হয় নাই। ছোটবেলা থেকেই জিঞ্জিরায় ছোট দোকান নিয়ে স্টেশনারি ব্যবসা করতেন। দোকানের যে আয় তা দিয়ে সংসার সচ্ছলভাবে চলত না। তা ছাড়া তার শ্যালক ইটালি থাকায় একসময় সিদ্ধান্ত নেন বিদেশ যাওয়ার। স্ত্রী মেরী বেগমের পরামর্শে একই গ্রামের মনির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মনির হোসেন দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে লোক পাঠায়। একই গ্রামের প্রায় এক-দেড়শ' লোক ইটালিতে পাঠিয়েছে এই মনির। অনেকটা বিশ্বাস এবং আস্থা রেখে মনিরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মোঃ আবু হানিফ এবং মেরী বেগম দু'জনই মনিরের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন আবু হানিফ ২০০৩ সালের জুলাই মাসে। মনির তাদের জানায়, ইটালি যেতে মোট ৫ লাখ টাকা লাগবে। স্বপ্নের দেশ ইটালি। এখানে যেতে হলে কিছুটা ঝুঁকি নিতে হবে- এটা মেনে নিয়েই রাজি হয়ে যান। মনিরের দাবিমতো প্রথম কিস্তির ১ লাখ টাকা দেন ডিসেম্বর ২০০৩ সালে। বৌয়ের গহনা বিক্রি করে প্রথম কিস্তির টাকা দেন। টাকা লেনদেন করার সময় কোনো মানি রিসিট দেয় নাই। মৌখিক বিশ্বাসের ওপর লেনদেন চলে। সাধারণত বিদেশ যাবার জন্য এই দালালেরা কোনো মানি রিসিট কখনই দেয় না। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখে বাকি ২ লাখ টাকা সংগ্রহ করে মনিরকে দেয়। এই টাকা ডিপিএস-এর ওপর

লোন এবং ব্যক্তিগত ধারদেনা করে সংগ্রহ করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে তারা দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন। ৩৮ জন বাংলাদেশী এই ফ্লাইটে ছিল। এদের সকলেরই মালি পর্যন্ত ভিসা দেওয়া হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, মালি পৌছানোর পর চোরাইপথে আলজেরিয়া দিয়ে ইটালি পৌছাতে হবে। মালি থেকে ২-৩ ঘন্টা সময় লাগবে। বাংলাদেশ থেকে ৩৬ জনের দল অত্যন্ত উৎফুল্লভাবে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ থেকে দুবাই যাবার পথে তেমন কোনো অসুবিধা হয় নাই। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অধিকাংশ কর্মকর্তা মনিরের পরিচিত। তারা মনিরের লাগেজ টেনে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনির একে একে ৩৬ জনের পার্সপোর্ট দেখিয়ে ইমিগ্রেশন রুম পার হয়ে বিমানে উঠে পড়ে। বাংলাদেশ বিমান দুবাইর উদ্দেশে রওনা দেয়। সবাই আন্তরিকভাবে মনিরকে ধন্যবাদ দেয়। মনির এ সময় ঐ ফ্লাইটে তাদের সঙ্গে ছিল।

বিমান দুবাই এয়ারপোর্টে পৌছায়। এয়ারপোর্টে আগতদের মধ্যে ২ জন পাকিস্তানি দালাল ছিল। তারা মাথায় পাগড়ি পরে আরবিতে কথা বলে। এখানে ট্রানজিটের জন্য ৪ ঘন্টার মতো অপেক্ষা করতে হয়। তারপর দুবাই থেকে গ্যাবন এয়ার লাইন্সে গ্যাবনের উদ্দেশে রওনা দিই। দুবাই থেকে গ্যাবনে পৌছাতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘন্টা। ভাগ্যের ওপর ভরসা করেই তখন আমাদের এগিয়ে চলা। চিরসবুজ বাংলা শ্যামল মাকে ছেড়ে বিমান যখন মরুভূমির ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন কেবলই আমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবনের দুরন্ত দিনগুলোর কথা মনে হচ্ছিল। প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহময়ী মা আর আদরের সন্তানদের মুখচ্ছবি বারবার ভেসে উঠছিল মানসপটে।

গ্যাবনের এয়ারপোর্টে পৌছালে দালাল মনিরের লোকজন এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের নিয়ে যায় গ্যাবন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। এই হোটেলে আমরা ছিলাম মোট ২ দিন। হোটেলের খাবার-দাবার ছিল চমৎকার। গ্যাবন থেকে ২ দিন পরে মালিতে গিয়ে পৌছাই। এ যাত্রাও ছিল বিমানে। মালি বিমানবন্দরে পাকিস্তানের দালালেরা মনিরের ল্যাগেজ বহন করে নিয়ে যায়। পরে পাকিস্তানি দালালেরা আমাদের দ্বিতল ভবনের একটি বাসায় নিয়ে যায়। বাসায় কোনো লোকজন ছিল না। পাকিস্তানি দালালরা খাবার-দাবার নিয়মমতো দিয়ে যেত। এই ঘরে আমরা ২০ দিন ছিলাম। ২০ দিন থাকার পর মালির পুলিশ আমাদের ঐ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় থানায়। আমরা বাসায় থাকলেও মনির ভিন্ন জায়গায় থাকত। তবে মোবাইলে সব সময় যোগাযোগ রাখত। থানার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে আমাদের থাকার জায়গা হয়। দিন ও রাতের বিভিন্ন সময় লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা এই থানার মধ্যে ঘোরা ফিরা করতাম। থানার পুলিশকে ঘুষ দিয়ে টেলিফোনে মনিরের সঙ্গে এবং দেশের বৌ, ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কথা বলতাম। থানায় ১০ দিন আটক রাখার পরে আমাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তবে থানার এই পুলিশেরা আমাদের ওপর কোনো অত্যাচার করে নাই। আমরা নিজেরা টাকা দিয়ে পুলিশের মাধ্যমে খাবার কিনে এনে খেতাম। ৫০০ শত ডলার ঘুষ দিয়ে এই থানা থেকে আমরা মুক্তি পাই। আমাদের মুক্তির জন্য মালির এই থানায় মনির কোনো তদবির করে নাই। থানা থেকে মুক্তি পাবার পর মনির আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অতঃপর মালি থেকে পাশের বরকিনা পাচক নামে ছোট্ট রাষ্ট্রে গিয়ে পৌছাই। এখানে আমরা বাসে চড়ে এসেছিলাম। সময় লেগেছিল এক দিন ও এক রাত বরকিনা পাচক রাষ্ট্রের রাজধানী ওগাভাগো। এখানে আমরা ৮-১০ জন করে ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পৌছাই। এ সময়ও দালাল মনির আমাদের সঙ্গে ছিল। রাস্তায় বাসের ভাড়া এবং খাবার-দাবারের ব্যবস্থা সে করেছিল।

ওগাভাগোর ধামকাপাড়ার একটি বাড়িতে আমরা উঠি। আমাদের পৌছে দিয়ে মনির চলে যায়। বলে যায় ইটালি ২-৩ দিনের মধ্যে পৌছে দিব। মনিরের সঙ্গে সব সময় আমাদের যোগাযোগ ছিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এখানে এই বাসায় আমরা প্রায় এক মাস অবস্থান করি। এক মাস অবস্থানের পর আবার বাসে করে মালিতে ফিরে আসি। মালির রাজধানীর বামাকোর একটি হোটেলে ২ দিন অবস্থান করি। ২ দিন থাকার পর মালির আর একটি শহর গাউতে চলে যাই। গাউ শহরের একদিন থাকার পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে ল্যান্ডকোচ (জিপগাড়ি) করে আলজেরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা দেই। এই জিপগাড়িতে সর্বোচ্চ লোক ধরে ১৩ জন। সেখানে আমরা ২১ জন চড়তে বাধ্য হই। ২টি গাড়িতে ৪২ জন যাত্রী রওনা দেই। মালি থেকে আমরা যখন রওয়ানা দেই মনির তখন আমাদের বলেছিল ২-৩ দিন সময় লাগবে। আলজেরিয়া পৌছালে ২-১ দিনের মধ্যে আলজেরির দালারেরা ইটালি পৌছে দিবে।

বিখ্যাত সাহারা মরুভূমির নাম শুনেছি। এখন সেই মরুভূমির ওপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে গাড়ি চলা শুরু করল। যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু বালি আর বালি মাঝে মাঝে পাথরের কণা। কোনো জনমানব নেই। বসতি নেই। গাড়ি টানা ২ থেকে ৩ ঘন্টা চলত, তারপর জিরিয়ে নিত।

জিপের ড্রাইভার আলজেরীয়। পরে জেনেছি সে একটি মাফিয়া গ্রুপের সদস্য। অন্তরে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। নিরেট কসাই। উত্তপ্ত সূর্য মাথার ওপর এসে দাঁড়ালে মনে হতো মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটে বেরিয়ে আসবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ি। সারা দিনে দুই-তিন গ্লাস খাবার পানি পেতাম তা দিয়ে কোনোভাবেই তৃষ্ণা নিবারণ হতো না।

দিনের তীব্র গরমে সেদ্ধ হয়ে যখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা। আবার রাতে প্রচন্ড শীত। বিছানাপত্র কিছু ছিল না। গায়ের কাপড় বিছিয়ে মরুভূমির বালুর ওপর শুয়ে পড়তাম। পরিষ্কার আকাশ। বড় চাঁদ দেখে সুকান্তের সেই বিখ্যাত কবিতার কথা মনে হতো। বারবার মনে হতো এই চাঁদ যদি একটি বড় রুটি হয়ে মুখের কাছে আসত, তবে ক্ষুধা নিবারণ করতাম। আবার চাঁদের গায়ে কালো রেখা দেখে মনে হতো ওটা ফুটা হয়ে যদি পানি পড়তো পরান ভরে পানি খেয়ে নিতাম। মরুভূমির মধ্যে চলার তৃতীয় দিন পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। এ সময় আমরা পানিতে আঙুল ভিজিয়ে তা চেটে খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করার চেষ্টা করতাম। সঙ্গের শুকনা খাবার বিস্কুট শেষ হয়ে আসে। ভয়ঙ্কর গরম, পানি নেই। তীব্র শীত, গরম পোশাক নেই। পেটে প্রচন্ড ক্ষুধা, খাবার নেই। কষ্ট কাকে বলে...।

মরুভূমিতে চলার চতুর্থ দিন বিকালে প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে সবাইকে ২টি গাড়ির আড়ালে চলে আসতে বলে। মুখে পাগড়ি বেঁধে মুখ নিচু করে বালির মধ্যে রাখতে বলে। ধরে নিয়েছিলাম রোজ কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে শো শো শব্দ আর বালি উড়ছে। আমরা মৃত্যুর প্রহর গুনছি আর সমানে দোয়া-দরূদ পড়ছি। ঝড় শেষ হয়ে গেলে গায়ের বালি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয়। খাবার এবং পানীয় জলের অভাবে আমরা পাগলপ্রায় হয়ে উঠি। অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ে। মরুভূমির এবড়োথেবড়ো বালির পাহাড়ে ছুটছে গাড়ি। সবারই প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সত্যি সত্যি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লেন সাভারের ছলমাসি গ্রামের নূরুল হক। নূরুল হক বারবার পানি খেতে চাইছিল। তাকে একটু পানিও আমরা খাওয়াতে পারিনি। জিপের ড্রাইভারের কাছে পানি থাকলেও সে খেতে দেয়নি। নূরুল হক মারা যাওয়ার আগে আমাদের বলে যায়, তার কাপড়গুলো যেন আমরা তার মায়ের কাছে পৌছে দেই। মোঃ নূরুল হক মারা গেলে আমরা সবাই মিলে জানাজা পড়ি। গোসল দিতে পারি নাই।

সাহারা মরুভূমির বালু খুঁড়ে দেড় ফুটের মতো গর্ত করে কোনো রকমে কবর দেই। কবরে লাশ নামানোর সময় শুধু বারবার মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের অন্যকোনো যুবক যেন না জেনে এ ভয়ঙ্কর মৃত্যু পথে পা না দেয়।

নুরুল হকের মৃত্যুর পরে আমরা সবাই ভেঙে পড়ি। সবাই তখন ভাবছিলাম যে কোনো সময় আমরা যে কেউ মারা যেতে পারি। ভয় ও আতঙ্ক আমাদের গ্রাস করে ফেলেছিল। আমাদের খাবার এ সময় সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য ড্রাইভারের কাছ থেকে পিঁয়াজ এবং মুলা চেয়ে নিয়ে খেতে শুরু করি। কাঁচা পিঁয়াজ এবং মুলাই তখন ক্ষুধা নিবারণের একমাত্র নিয়ামক।

এভাবে ৬ দিন চলার পর একদিন রাত ৩টার দিকে গাড়ি আলজেরিয়ার শহর আদ্রায় গিয়ে পৌঁছায়। এখানে রাস্তার পাশে আমাদের ফেলে রেখে গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার চলে যায়। রাত পার হয়ে সকাল হলো রাস্তার পাশেই কেটে গেল সারা রাত। লোকালয়ের সন্ধানে সামনে এগিয়ে গেলাম। একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে আশ্রয় নেই। স্থানীয় আলজেরিয়ানরা আমাদের খাবার এনে দেয়। কিছু খাবার তাদের মাধ্যমে আমরা কিনে আনি।

আমরা এখানে আছি- ইতিমধ্যে খবর রটে গেছে। পলে যা হবার তাই হলো। দুপুরের দিকে আলজেরিয়া ন্যাশনাল গার্ডের পুলিশ এসে আমাদের ধরে নিয়ে। থানা হাজতে আটকে রাখে। এ সময় আমাদের মধ্যে যারা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে । সকল সদস্যের খাবারের ব্যবস্থা করে। চিকিৎসা নিয়ে মোটামুটি সুস্থ হলে কোর্টে চালান করে দেয়। প্রথম হাজতখানায় ১৫ দিন যাবার পর একটি কোর্টে চালান করে দেয়। সেখান থেকে অপর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৫ দিন হাজত খাটার পরে অপর কোর্টে চালান করে দেয়। হাজতখানায় থাকাকালীন আমরা পুলিশের সহযোগিতায় মনিরের সঙ্গে যোগযোগ করি। সে বলে কয়েক দিনের মধ্যে ছাড়িয়ে নিয়ে ইটালি পাঠিয়ে দেবে।

এভাবে তিন হাজতে ৪৫ দিন হাজত খাটি। আমরা যখন আলজেরিয়ায় হাজত খাটি মনির তখন মালিতে অবস্থান করত। যেখান থেকে যোগাযোগ হতো। ৪৫ দিন হাজত খাটার পরে আলজেরিয়া সিকিউরিটি গার্ডের সদস্যরা তাদের গাড়িতে করে বর্ডারে নিয়ে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে আমাদের ছেড়ে দেয়। কিছু দিন পরে আবার ধরে নিয়ে আসে। আমরা এই সময় মনিরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। মনির বলেছিল আলজেরিয়া সিকিউরিটি গার্ডের সদস্যরা তাদের সীমান্তের কাছে ছেড়ে দিয়ে আসলে সেখানে পাকিস্তানি দালালেরা জিপে নিয়ে যাবে। আমরা ঐ গাড়িতে করে ইটালি পৌঁছে দিতে পারব। আলজেরিয়া সীমান্তে একদিন আমাদের গাড়ি উল্টে যায়। তাতে একজন ইন্ডিয়ান নাগরিক মারা যায়। এখানে আরেকটি টিমের ১৩ জন বাঙালিকে আলজেরিয়া কোস্ট গার্ডের সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে বলে আমরা শুনেছি।

অবশেষে আলজেরিয়া ও মালির সীমান্ত দিয়ে জিপের সাহায্যে মৌরিতানিয়ার উদ্দেশে রওনা হই। পৌঁছাতে মোট সময় লাগে ২২ দিন। সাহারা মরুভূমির একটি অঞ্চলে দীর্ঘ ১০ দিন আমরা একটি গাছের নিচে রাত-দিন অতিবাহিত করেছি। ঐ সময় মৌরিতানিয়ার দালালরা এসে খাবার দিয়ে যেত। দীর্ঘ এ ২২ দিনের যাত্রায় মনে হতো আমরা পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো মানুষ নই। দালালরা আমাদের মরক্কোর সীমান্তের কাছাকাছি মৌরিতানিয়ার ইনাল সীমান্তে নিয়ে যায়। এই সীমান্ত দিয়ে মরক্কোর সীমান্তের মধ্যে ঢুকে পড়লে মরক্কো আর্মির হাতে ধরা পড়ি। পরে তারা আমাদের মৌরিতানিয়ার মধ্যে পুশব্যাক করে দেয়।

এ সময় মনিরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। এখানে আর্মির ঘাঁটিতে আমাদের একদিন আটকে রাখে। পুশব্যাক করে দেয়ার পর সম্পূর্ণ আল্লার ওপর ভরসা করে আমরা হাঁটতে থাকি। প্রায় ১২ থেকে ১৫ কিমি যাবার পর মরুভূমির মধ্যে আমরা একটি রেলপথ দেখতে পাই। সারা দিন চাতক পাখির মতো বসে থাকলেও কোনো ট্রেন আসে না। রাতের বেলায় একটি ট্রেন আসতে দেখি। আমরা সবাই মিলে চেঁচামেচি করে ট্রেন থামাবার চেষ্টা করলেও ট্রেন থামে নাই।

এসময় পাশেই একটি খাবার পানির কূপ দেখতে পাই। এই কূপ দেখে অশান্বিত হয়ে উঠি। আমরা ভাবতে থাকি কূপ যেহেতু আছে অতএব লোকজন একদিন আসবেই। এই আশায় অপেক্ষা করতে করতে তিন দিন পরে সীমান্তরক্ষীদের দেখতে পাই। তাদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সাহায্য করার আশ্বাস দিয়ে চলে যায়। পরে মৌরিতানিয়ার পুলিশ এসে আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তার করে প্রথমে আমাদের মৌরিতানিয়ার ইনালে নিয়ে যায়। পরে স্থানান্তর করে নয়াদিপুতে। এখানে হাজতে না রেখে সরাসরি কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। এখানে কারাবন্দি ছিলাম সাড়ে ৫ মাস। এখানকার পুলিশ আমাদের টেলিফোন করার সুযোগ করে দিত। এই সময় মনির আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে নাই। আমরা ইটালি যাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করতে থাকি।

এ সময় বাংলাদেশ অ্যাম্বাসির মোঃ সালাউদ্দিন আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। মূলত তার কারণে আমরা দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হই।

দেশে ফিরে এসে জীবনযাত্রা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। স্ত্রীর গহনা, মাঠান জমি, ব্যবসার টাকা, ঋণ করা টাকা সবই খুয়ে বসেছে মনিরের পিছনে। দালাল মনির দেশে নেই। বর্তমানে মালিতে অবস্থান করছে। মনিরের পরিবারের পক্ষ থেকে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। মনির স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের ঘনিষ্ঠজন। তার বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ থানায় কোনো মামলা হয় নাই। ভয়ে কেউ কথাও বলে না। মনিরের পরিবার থেকে বলা হচ্ছে, সাংবাদিকদের দিয়ে লেখালেখি করে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না, বিদেশ যাওয়া যাবে না। টাকার ফেরত পাবার আশায় সকল ভুক্তভোগী নিশ্চুপ হয়ে গেছে। সাংবাদিক দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে মনিরের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করে।

সরেজমিন খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, সাহারা মরুভূমির এই নির্মম ট্র্যাজেডির শিকার লোকজন প্রায় সকলেই অল্পশিক্ষিত। কিন্তু তারা কেন এতোটা বিপজ্জনক অবৈধপথে ইটালি যাবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন?

সুন্দর এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের স্বপ্ন এ দেশের তরুণরা যা দেখে তা নিয়ে প্রতারিত করার অধিকার কারো নেই। একদল অর্থলোভী আদম ব্যাপারীর অপতৎপরতায় অনেক পরিবার আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে এমন খবর মাঝে-মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু কেন এই বীভৎসতা? কেন এ মর্মস্পর্শী ঘটনা? কত সহস্র তরুণ ও তাদের স্বপ্নের সমাধি হচ্ছে এভাবে প্রতারকদের হাতে। এর কি কোনো প্রতিকার হবে না?